দৈনিক
জনকণ্ঠ
তারিখ ... 13 JUL 2008
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ২ ...

আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতির অভিযোগ

প্রিন্সিপাল বলেন, সাঈদ এস্কান্দারের স্ত্রী আমাকে চাপ দিয়ে পদত্যাগে বাধ্য করেন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে রাজধানীর আইডিয়াল কলেজ। অভিযোগ উঠেছে স্বয়ং কলেজের অধ্যক্ষ ড. শামসুল আলমের বিরুদ্ধে। যদিও ওই প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে সাধারণ শিক্ষকরা মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন। ছাত্র ও শিক্ষকদের চাপের মুখে আড়াই বছর আগে চাকরি থেকে নিজে সরে দাঁড়ালেও সম্প্রতি ফিরে আসায় কলেজে নতুন আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, একটি কলেজে এডহক কমিটি সর্বোচ্চ দু'বার গঠন করা যায়। কিন্তু প্রিন্সিপাল তার অনুগত এডহক কমিটি তৈরি করে নিজের নিয়োগের কাজটি সম্পন্ন করেছেন। নিয়োগ কাজটি শেষ করে নতুন একটি অডিট কাজ সম্পন্ন করেছেন। ওই অডিটের মাধ্যমে অতীতের সকল আর্থিক অনিয়মের ঘটনা ধামাচাপা দেয়া হয়েছে।

অভিযোগ আছে, অধ্যক্ষ শামসুল আলমের বিরুদ্ধে ২০০৫ সালে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্রদের দাবির মুখে চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে কলেজে অডিট টিমের প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে প্রায় এক কোটি ৯ লাখ টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া যায়। ওই সময় তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার ও আইন লঙ্ঘন করে পাঁচ বিদেশী নাগরিকসহ ১৯ জনকে প্রভাষক ও বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেন। এ ছাড়া ছাত্রদের কাছ থেকে আদায়কৃত টাকা আত্মসাত, বেনামে ঠিকাদারী করাসহ অন্যান্য দুর্নীতির ঘটনাও উদ্‌ঘাটিত হয়। কিন্তু অভিযোগ ওঠার পরও ওই সময় কলেজ পরিচালনা পরিষদ আইনী

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

আইডিয়াল কলেজের

(১২-এর পাতার পর)

ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর কলেজ পরিচালনা পরিষদ কমিটি বাতিল করে এডহক কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কলেজের কয়েক শিক্ষক অভিযোগ করে বলেন, প্রিন্সিপাল শামসুল আলম তার ক্ষমতা, অর্থ ও প্রভাব খাটিয়ে নিজের অনুগত একটি এডহক কমিটি গঠন করিয়েছেন। এভাবে তিনি দ্বিতীয় এডহক কমিটি তৈরির নেপথ্যেও কাজ করেন। তৃতীয় এডহক কমিটি তৈরি করে তার নিয়োগ নিশ্চিত করেন। কিন্তু আইনগতভাবে তৃতীয় বার এডহক কমিটি হলে তা হয় বিশেষ কমিটি। ওই কমিটির দায়িত্ব শুধু পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি করা, অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া বৈধ নয়। অভিযোগ রয়েছে তার প্রভাবিত বর্তমান এডহক কমিটিও বেশ কিছু অনৈতিক কাজ করেছে। দণ্ডপ্রাপ্ত আপন ভাতিজাকে কলেজের চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়েছে।

এ ছাড়া নিজের বেতন মাসিক ৯০ হাজার টাকা নির্ধারণ করে বাড়ি, গাড়ি, ড্রাইভারসহ বিভিন্ন সুবিধা অনুমোদন করেছেন।

সূত্র জানায়, ১৯৮৮ সালের ১০ মে সামসুল আলম কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পান। দায়িত্ব পাওয়ার আট বছরের মাথায় তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার অনিয়ম দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠে। এর প্রেক্ষিতে কলেজ পরিচালনা কমিটি ২০০৫ সালের ১০ অক্টোবর আটটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের কারণ দর্শাও নোটিস প্রদান করে। নোটিসের কোন জবাব না দিয়ে অধ্যক্ষ শামসুল আলম একই বছরের ১৮ অক্টোবর ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দেন। ওই সময় কারণ দর্শাও নোটিসের ওপর ভিত্তি করে তিন সদস্যের তথ্য উদ্‌ঘাটন কমিটি গঠন করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কমিটি ২০০৬ সালের ৪ মার্চ জমাকৃত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, শামসুল আলম দায়িত্বে থাকা অবস্থায় কলেজের ৩২ লাখ ১৯ হাজার ৫১৯ টাকা আত্মসাত করেন। অধ্যক্ষের কর্মকাণ্ডে প্রতি কর্তৃপক্ষের সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় একই সময়ে কলেজের ৫ বছরের আর্থিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য একটি অডিট ফার্মকে দায়িত্ব দেয়া হয়। অডিট ফার্মটি ২০০৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কাছে তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, অধ্যক্ষ শামসুল আলম দায়িত্বে থাকা অবস্থায় কলেজের প্রায় এক কোটি নয় লাখ টাকা আত্মসাত করেছেন। শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা খাত থেকে ১১ লাখ ১৮ হাজার টাকা, আসবাবপত্র ও ড্রয়ার খাত থেকে ২ লাখ ৩৮ হাজার টাকা, টাইলস স্থাপন থেকে ১৬ লাখ ১১ হাজার টাকা, বিদ্যাভবনের ফিনিশিং খাত থেকে ৭৩ লাখ ৪২ হাজার টাকা, কলেজ হোস্টেল খাত থেকে ১ লাখ সাড়ে ১৩ হাজার টাকা, ক্যান্টিন খাত থেকে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা আত্মসাত করেন। এ ছাড়াও কলেজের তিন সদস্যের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট মোতাবেক তিনি সাচিবিক বিদ্যা ও কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবহারিক পরীক্ষা এবং ভর্তি ফরম বিক্রির টাকা কলেজ তহবিলে জমা দেননি।

নিজের অনিয়ম দুর্নীতির সুবিধার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনিয়মের মাধ্যমে নিজের ভাতিজা, ভাতিজার স্ত্রী, ভাতিজির স্বামী, আপন শ্যালকসহ ১৪ জন অতি কাছের আত্মীয়কে চাকরি দিয়েছেন কলেজে। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করে ৫ ভারতীয় নাগরিককেও কলেজে চাকরি দিয়েছেন তিনি।

এ ব্যাপারে ড. শামসুল আলমের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি জনকণ্ঠকে জানান, চাকরি থেকে আমি সরে দাঁড়াইনি। ওই সময় সাঈদ এস্কান্দারের স্ত্রী নাসরিন সাঈদ তার বাসায় নিয়ে চাপ দিয়ে আমাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। আমি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিনি। আমার বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ এনে ওই সময় এ কাজটি করা হয়েছে। আর্থিক অনিয়ম বিষয়ে যে নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে, এটা তাদের পছন্দের একটি প্রতিষ্ঠান দিয়ে তৈরি করানো হয়েছে। কারণ আমি কলেজ থেকে বের হয়ে মামলা করতে পারি এ জন্য সাজানো অডিট রিপোর্ট করা হয়েছে নিজেদের রক্ষার জন্য। পরবর্তীতে কলেজ পরিচালনা কমিটি ওই অডিট রিপোর্টের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ওই রিপোর্ট কলেজ পরিচালনা কমিটি গ্রহণ করেনি। যাচাই বাছাই করে নতুন আর্থিক প্রতিবেদন রিপোর্ট জমা দিতে বলা হলেও তা দেয়া হয়নি। একটি গ্রুপ পুরনো অডিট রিপোর্ট বিভিন্ন স্থানে জমা দিয়ে আমাকে হেয় করার চেষ্টা করছে। আমি কলেজের প্রিন্সিপাল পদে বিধি মোতাবেক নিয়োগ পেয়েছি। ঢাকা শহরে আমার সকল সম্পত্তির ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে হিসাব জমা দেয়া আছে। এর বাইরে আমার কোন সম্পদ নেই।